আশুরা ও কারবালা

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

عاشوراء بين الاتباع والابتداع

محمد سيف الدين بلال

إصدار المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء

عاشوراء بين الاتباع والابتداع

আশুরা ও কারবালা

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

সূচীপত্র

লেখকের আবেদন

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ] এবং তাঁর পরিবার, সাহাবা কেরাম ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের উত্তম অনুসারীদের প্রতি বর্ষিত হোক।

ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন দুই প্রকার: জাতীয় ও বিজাতীয় তথা বাইরের ও ঘরের। বিজাতীয় শত্রুরা যখন দূর থেকে আশানুরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারেনি, তখন জাতীয় ও ঘরের শত্রু বানানোর জন্য সকল প্রকার চেষ্টা-তদবির করতে ভুল করেনি।

বিজাতীয় শত্রুরা মুনাফেক মুসলমান সেজে বা সাজিয়ে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে; আহলে বাইত (নবী পরিবার)-এর মিথ্যা ভালবাসা দেখিয়ে সর্বদা বেশি ক্ষতি করেছে।

একটি দল আহলে বাইতের মহব্বতের কথা বলে মিথ্যার যে পাহাড় গড়েছে; এমন মিথ্যা অতীতে বা বর্তমানে আর কেউ গড়তে পারেনি। এই দলটি আশুরার মূল বিষয়কে কারবালার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে নিজেদের কুমতলব হাসিলের অপচেষ্টা করেছে।

এদের কালো ইতিহাস ইসলাম ও মুসলমানদের কি কি ধ্বংস ঘটিয়েছে তা বিজ্ঞজনদের জানা। কিন্তু দু:খজনক ব্যাপার হলো: এদের খপ্পড়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ ও অনেক পণ্ডিত ও ইসলামী চিন্তাবিদরা। শিয়া-রাফেজীদের পেছনের গোপন রহস্যজনক চেহারা না চেনে লোকেরা তাদের বাহ্যিক চেহারা দেখে প্রভাবান্বিত হয়েছে। এমনকি তারা সাহাবাগণের ব্যাপারে কটুক্তি করতে দিধাদ্বন্দ্ব করেনি।

বড় আফসোসের কথা হচ্ছে: দুশমনদের মিথ্যা ইতিহাস পড়ছে ও পড়াচ্ছে মুসলমানরা তাদের পাঠশালাগুলোতে। এর চাইতে বড় অজ্ঞতা আর কি হতে পারে?

আশুরার দিন রোজা না রেখে মিটিং-মিছিল ও মাহফিল করে শত্রুদের কাজে সহযোগিতা করে এক শ্রেণীর নামধারী আলেম সমাজ। আর তাদের অনুসরণ করে সাধারণ মূর্খ জনগণ।

তাই আশুরা ও কারবালার বিষয়ে সঠিক জ্ঞান মুসলিম সমাজকে জানানোর উদ্দেশ্যে আপনাদেরকে উপহার দিচ্ছি এ ছোট্ট বইটি।

বইটির প্রথম প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো চোখে পড়লে অথবা কোন নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে। ইন শাাআল্লাহ তা'য়ালা।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
০৩/০৭/১৪৩২হি:
০৪/০৬/২০১১ ইং

2 আশুরার অর্থ:

আশুরা শব্দটি শুনতেই সাধারণ মানুষের যেন গা শিউরে ওঠে; কারণ আশুরা বলতেই তাদের ধারণা কারবালা। আর কারবালা অর্থ নবী [ﷺ]-এর নাতি ইমাম হুসাইন ইবনে আলী [ﷸ]-এর স্বপরিবারে মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা। কিন্তু আসলে আশুরা অর্থ চন্দ্র বছরের প্রথম মাস মোহররমের দশম তারিখ। আল্লাহ তা'য়ালা ১২টি মাসের মাঝে ৪টি মাস যথা: যিলকদ, জিলহজ্ব, মোহররম, ও রজবকে হারাম তথা সম্মানিত মাস করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

~ } | { z y x w v u t [

يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ ©

ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴿٣٦﴾ Z التوبة

"নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি হারাম-সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান;

সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না।” [সূরা তাওবা:৩৬]

আর গুরুত্বপূর্ণ দশটি জিনিস এ দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আশুরা নামকরণ হয়েছে; মনে করার কোন সঠিক প্রমাণ নেই।

2 আশুরার ফজিলত:

হিজরি সালের ১২টি মাসের মধ্যে চারটি হারাম মাস। যিলকদ, যিলহজ্ব, মোহররম ও রজব। শুরু হারাম মাস মোহররম ও শেষ হারাম মাস যিলহজ্ব এবং মধ্যখানে হারাম মাস রজব। আরবরা মোহররম মাসকে ‘‘স্বফরুল আওয়াল’’ তথা প্রথম সফর নাম রেখে যুদ্ধকে তাদের ইচ্ছামত হালাল ও হারাম করতো। আল্লাহ তা‘য়ালা ইহা বাতিল করে দিয়ে তার ইসলামি নামকরণ করলেন আল-মুহাররাম। তাই গুরুত্বের জন্য মোহররম মাসকে “শাহরুল্লাহিল মুহাররাম” তথা আল্লাহর মোহররম মাস বলা হয়েছে।

আশুরার দিন নি:সন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এ দিন আমাদেরকে এক ঐতিহাসিক ঘটনার কথা

স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বীন হেফাজতের উদ্দেশ্যে হিজরত ও হক প্রতিষ্ঠার জন্য এক মহান দিন।

আর এ জন্যই দিনটিকে বিশেষ এক ইবাদত–রোজার সাথে স্মরণ করা প্রতিটি মুসলিমের উচিত।

একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট যে, মূসা [عليه السلام] ও তাঁর জাতি বনি ইসরাঈল ফেরাউনের অন্যায়-অত্যাচার, নিষ্পেষণের জাঁতাকল ও গোলামী থেকে মিশর ছেড়ে সাগর পার হয়ে এ দিনে নাজাত পেয়েছিলেন। তাই আল্লাহর শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞার্থে এ দিনে রোজা রেখেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে বনি ইসরাঈলরাও রোজা রাখত।

এটি একটি গুরুত্বপূণ দিন, যার ফজিলত ও তাৎপর্য অধিক। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো:

(ক) এ দিনে মূসা [عليه السلام] ও বনি ইসরাঈলের নাজাত ও ফেরাউন ও তার জাতির ধ্বংস:

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রসুল মূসা [عليه السلام] ও বনি ইসরাঈলকে ফেরাউনের জুলুম থেকে এ দিনে নাজাত দেন এবং ফেরাউন ও তার জাতিকে বাহরে কালজুম তথা লহিত সাগরে ডুবিয়ে হালাক-ধ্বংস করেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

= < ; : 9 8 7 6 5 [

البقرة Z ? >

"আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি, অত:পর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরাউনের লোকদিগকে তোমাদের চোখের সামনে।" [সূরা বাকারা:৫০]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

5 4 3 2 1 0 / . [

B A @ ? > = < ; : 9 8 6

N M L K J I H G F E D C

W V U T S R Q P O

يونس Z b a ` _ ^] \ [Y X

"আর আমি বনি ইসরাঈলকে পার করে দিয়েছি সাগর। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরাউন ও

তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন মাবুদ নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনি ইসরাঈলরা। বস্তুত: আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। এখন একথা বলছ! অথচ তুমি ইতিপূর্বে নাফরমানি করছিলে! এবং পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। এতএব, আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। আর নি:সন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না।" [সূরা ইউনুস:৯০-৯২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ ؟ » فَقَالُوا : هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ ، أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا ، فَنَحْنُ نَصُومُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « فَنَحْنُ أَحَقُّ

وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ » فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِه .متفق عليه

৩. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ [ﷺ] যখন মদিনায় আগমন করলেন তখন দেখলেন যে, ইহুদিরা আশুরার রোজা পালন করে। তখন তিনি [ﷺ] তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমরা এ দিনে কেন রোজা রাখ?" তারা বলল: এটা এক মহান দিবস। এ দিনে আল্লাহ মূসা [عليه السلام] ও তার জাতিকে নাজাত দেন এবং ফেরাউন ও তার জাতিকে ডুবিয়ে হালাক-ধ্বংস করেন। তাই মূসা [عليه السلام] ও তাঁর জাতি এদিনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে রোজা রাখেন এ জন্যে আমরাও রাখি।

রসুলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:"আমরা মূসা [عليه السلام]-এর অনুসরণ করার বেশি হকদার।" এরপর তিনি [ﷺ] আশুরার রোজা রাখেন এবং সাহাবাগণকেও রোজা রাখার জন্য নির্দেশ করেন।[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২০২৪ ও ৩৩৯৭ মুসলিম ১১৩০ ও ১২৮ শব্দ তারই

(খ) নবী [ﷺ] এ দিনের রোজা অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি অনুসন্ধান করতেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:« مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ ».متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসুলুল্লাহ [ﷺ]কে যেভাবে আশুরা ও রমজানের রোজার গুরুত্ব সহকারে অনুসন্ধান করতে দেখেছি অনুরূপ অন্য কোন রোজার ব্যাপারে দেখেনি।”[১]

(গ) এ দিনে ছোট বাচ্চারাও রোজা রাখত:

عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ ، قَالَتْ :فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৮৬৭ মুসলিম ২/১১৩২

وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: وَنَصْنَعُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ ، فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمْ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ.

রুবাইয়‘ বিনতে মু‘আওবেয (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] আশুরার দিন সকালে আনসারী সাহাবাগণের গ্রামগুলোতে দূত পাঠিয়ে ঘোষণা দিতে বলেন:“যে ব্যক্তি সকালে কিছু খেয়ে ফেলেছে সে যেন বাকি দিন না খেয়ে পূর্ণ করে। আর যে ব্যক্তি না খেয়ে আছে সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে। তিনি (রুবাইয়‘) বলেন: এরপর আমরা নিজেরা রোজা রাখতাম এবং আমাদের বাচ্চাদেরকেও রোজা রাখাতাম। আর তাদেরকে তুলা দ্বারা বানানো খেলনা দিতাম। যখন তাদের কেউ খানার জন্য কাঁদত তখন ইফতারি পর্যন্ত ঐ খেলনা দিয়ে রাখতাম।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে: আমরা বাচ্চাদের জন্য তুলা দ্বারা খেলনা বানাতাম এবং আমাদের সাথে রাখতাম। যখন তারা খানা চাইত তখন তাদেরকে

খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম; যাতে করে তারা তাদের রোজা পূর্ণ করে।"[১]

(ঘ) এ দিনের রোজা রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে ফরজ ছিল:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

متفق عليه.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জাহেলিয়াতের জামানায় কুরাইশরা আশুরার রোজা রাখত এবং রসুলুল্লাহ [ﷺ] ও রাখতেন। এরপর যখন তিনি মদিনায় আগমন করলেন তখন তিনি আশুরার রোজা রাখেন এবং রাখার জন্য নির্দেশ করেন। অত:পর যখন রমজানের রোজা ফরজ হলো

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৮২৪ মুসলিম হাঃ নং ১৯১৯

তখন তিনি [ﷺ] আশুরার রোজা (ফরজ হিসাবে) রাখেননি। (সুন্নত হিসাবে রেখেছেন) এরপর যে চাইত রাখত এবং যে চাইত রাখত না।”[১]

(ঙ) এ রোজা আল্লাহর মাস মোহররম মাসে যার স্থান ও মর্যাদা রমজান মাসের পরেই:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ». رواه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“রমজানের পরে সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে আল্লাহর মাস মোহররমের রোজা।”[২]

(চ) এ দিনের রোজা গত এক বছরের পাপকে মিটিয়ে দেয়:

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৮৬৩ মুসলিম হাঃ নং ১৮৯৯

[২]. মুসলিম ও তিরমিযী হাঃ নং ৬৭১

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ:«صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَأَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ». رواه مسلم.

আবু কাতাদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ [ﷺ]কে আশুরার রোজার ফজিলত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:"আশুরার রোজার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট আশা করছি যে, তিনি বিগত এক বছরের পাপ ক্ষমা করে দিবেন।"[১]

(ছ) আশুরার রোজা রাখার নিয়ম:

১. শুধুমাত্র দশম তারিখের রোজা রাখা জয়েয, যা ইবনে আব্বাস [ﷺ]-এর হাদিসে উল্লেখ হয়েছে যে, নবী [ﷺ] আশুরার রোজা রাখার জন্য তা তালাশ করতেন।

২. দশম তারিখের সাথে নবম তারিখও রোজা রাখা সুন্নত; যাতে করে ইহুদি-খ্রীষ্টানদের সাথে সদৃশ না

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৯৭৬

হয়। আর ইহাই হলো সর্বোত্তম যা সাহাবা কেরাম নবী [ﷺ]-এর মৃত্যুর পর করতেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ ». قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه مسلم.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন রসুলুল্লাহ [ﷺ] আশুরার রোজা রাখেন এবং রাখার জন্য নির্দেশ করেন। (পরবর্তীতে) (সাহাবীগণ) বললেন: এ দিনটিকে ইহুদি-খ্রীষ্টানরা বড় সম্মান দান করে। রসুলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ চাহে তো যখন আগামি বছর আসবে তখন আমরা নবম তারিখেও রোজা রাখব।" কিন্তু

পরের বছর আশুরা আসার পূর্বেই রসুলুল্লাহ [ﷺ] মৃত্যুবরণ করেন।"[১]

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ». رواه مسلم.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [رضي الله عنهما] থেকে বির্ণত তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যদি বেঁচে থাকি তবে অবশ্যই নবম তারিখেও রোজা রাখব।"[২]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: صُومُوا التَّاسِعَ مَعَ الْعَاشِرِ.

৩. ইবনে আব্বাস [رضي الله عنهما] থেকে বির্ণত তিনি বলেন: তোমরা দশমের সাথে নবম তারিখও রোজা রাখ।[৩]

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৯১৬
[২].মুসলিম হাঃ নং ১৯১৭
[৩]. মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদিসটির সনদ সহীহ-বিশুদ্ধ

(জ) আশুরার কিছু বিধান:

১. শুধুমাত্র নবম তারিখের রোজা রাখা ঠিক না। ইহা ইবনে আব্বাস [ﷺ]-এর হাদীস দ্বারা কিছু মানুষ ভুল বুঝে থাকে।

২. শুধুমাত্র দশম তারিখের রোজা রাখাকে কেউ কেউ মাকরুহ বলেছেন। কিন্তু সঠিক মত হলো: তা মাকরুহ নয়। কারণ জীবনে একবার দশের পূর্বে নবম তারিখ রোজা রাখলেই ইহুদি-খ্রীষ্টানদের সদৃশ থেকে বের হয়েছে ধরা যাবে। আর নবী [ﷺ] তো শুধুমাত্র দশ তারিখের একটি মাত্র রোজা রেখেছেন তাঁর জীবনে নবম রাখার সুযোগ হয়নি।

৩. দশ ও এগারো তারিখে রোজা রাখার হাদীস সহীহ-বিশুদ্ধ নয়।

৪. আশুরার আগে এক দিন ও পরে এক দিন অর্থাৎ ৯, ১০ ও ১১ তারিখের রোজা রাখার হাদীস দুর্বল।

৫. আশুরার রোজা রাখতে না পারলে কাজা করার কোন বিধান নেই। কাজা করা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব মনে করা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

৬. ছোট বাচ্চাদেরকে রোজা রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা বাবা-মার পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।
৭. আশুরা ও মোহররম মাসকে কেন্দ্র করে একমাত্র রোজা ছাড়া আর অন্য কোন ইবাদত কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

আশুরার রোজা ও মানুষের প্রকার

প্রথম প্রকারঃ

যারা সহীহ হাদিসের ভিত্তিতে নবম ও দশম তারিখ রোজা রাখেন এবং গত এক বছরের পাপরাজি মাফের জন্য আল্লাহর কাছে আশা করেন। আর এরাই হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে সঠিক আকিদার মানুষ।

দ্বিতীয় প্রকারঃ

যারা আহলে বাইত (নবী পরিবার ও তাঁর বংশধর)-এর মিথ্যা ভালবাসার দাবিদার। এরা আশুরাকে হুসাইন [ﷺ]-এর ইরাকের কারবালার প্রান্তে স্বপরিবারে মর্মান্তিক শাহাদাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে থাকে। এরা আশুরাকে দু:খ, মাতম ও তাজিয়া দ্বারা শোকের দিন হিসাবে নির্দিষ্ট করে। আর অনেক জাল হাদীস বানিয়ে পবিত্র আশুরার রোজাকে মানসূখ তথা রহিত ও পাপের কাজ বলে উল্লেখ করে।

জাল হাদীস যেমন:

১. "ইমাম রেজাকে আশুরার রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: এ দিনে এজিদ পরিবার হুসাইন [ﷺ] ও তাঁর পরিবারের শাহাদাতে

আনন্দ-উল্লাস করে রোজা রেখেছিল। অতএব, যে এই দিনে রোজা রাখবে সে কিয়ামতের দিন বক্র অন্তর নিয়ে উপস্থিত হবে।"[১]

২. "যে এই দিনে রোজা রাখবে তার অবস্থা এজিদের পরিবারের অবস্থা হবে। অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[২]

তৃতীয় প্রকারঃ

যারা দ্বিতীয় দলের বিপরীত করতে গিয়ে বহু জাল হাদীস গড়েছে এবং রোজা না রেখে খানাপিনা, আনন্দ ও উল্লাসের দিন বানিয়েছে আশুরাকে। আর তাদের বানানো যঈফ-জাল হাদীসের মধ্যে। যেমন:

«مَنْ وَسَّعَ عَلَى عَيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَةِ».

[১]. সিয়ামু আশুরা পৃঃ ১১৭-১১৮ মান কাতালাল হুসাইন পৃঃ ৯৫ কিতাবদ্বয় দ্রঃ

[২]. সিয়ামু আশুরা পৃঃ ১১৮ মান কাতালাল হুসাইন পৃঃ ৯৫ কিতাবদ্বয় দ্রঃ

১. "যে ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য আশুরার দিন পর্যাপ্ত খানাপিনার ব্যবস্থা করবে আল্লাহ তার সমস্ত বছরের রুজিতে স্বচ্ছলতা দান করবেন।" [১]

« مَنِ اكْتَحَلَ بِالإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْمَدْ مِنْ ذَلِكَ الْعَامِ، وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ عَاشُورَاءِ لَمْ يَمْرَضْ ذَلِكَ الْعَامِ ».

২. "যে ব্যক্তি আশুরার দিনে চোখে সুরমা লাগাবে, সে বছর তার চোখ উঠবে না (চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত হবে না) আর যে আশুরার দিনে গোসল করবে সে বছর তার কোন অসুখ হবে না।।"[২]

---

[১].হাদিসটি দুর্বল, আলবানী (রহঃ)-এর সহীহ ও যঈফুল জামি' হাঃ নং ৫৮৭৩ দ্রঃ

[২]. হাদিসটি জাল, আলবানী (রহঃ)-এর সহীহ ও যঈফুল জামি' হাঃ নং ৫৪৬৭ ও সিলসিলা যঈফা: ২/৮৯ দ্রঃ

কারবালার মর্মান্তিক ইতিহাস

আমাদের নিকট সুস্পষ্ট যে, কারবালার ইতিহাসের সাথে আশুরার রোজার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ঘটনা চক্রে হুসাইন [ﷺ]-এর শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনা দশই মোহররমেই ঘটেছিল।

হুসাইন [ﷺ]-এর কারবালার প্রান্তে শাহাদাতের ইতিহাসে প্রবেশ করার পূর্বে আমরা আপনাদেরকে একটু আগের পর্বে নিয়ে যেতে চাই।

ইসলামের তাওহিদী পতাকা যখন আল্লাহর জমিনে পত্পত্ করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উড়তে শুরু করল, তখন ইসলাম ও মুসলিমদের চিরশত্রু ইহুদি-খ্রীষ্টানরা বসে না থেকে, ইসলাম ও মুসলিম জাতির ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন প্রকার চক্রান্ত ও পলিসি হাতে গ্রহণ করা আরম্ভ করল। এর মধ্যে ইয়েমেনের অধিবাসী মুনাফেক আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার ইসলামি পোশাক ধারণ করা ছিল সবচাইতে মারাত্মক। সে একজন ইহুদির সন্তান ছিল। এই মুনাফেকের মুসলিম রূপে আবির্ভাব হওয়ায় পরে ইসলামের মূল শিকড় কাটার জন্য সর্বপ্রথম পরিকল্পনা ছিল, উসমান ইবনে

আফফান [ﷺ]কে হত্যা করা। তাই খলিফার বিরুদ্ধে মিথ্যা কিছু অপবাদ দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং কুরআন তেলাওয়াত করা অবস্থায় তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

মাত্র ১৪ জন কুচক্রী সাবায়ী দল তৃতীয় খলিফা যুননূরাইনকে হত্যা ছিল হিজরি ৩৫ সালে। তিনি এ হত্যাকে নিজেই মেনে নিয়েছিলেন এ বলে যে, "আমার কারণে মুসলমানদের মাঝে যেন রক্তপাত ও খুনাখুনি না ঘটে।"

তিনি এ বিদ্রোহের প্রতিবাদকারীদেরকে রক্ত প্রবাহিত হবে বলে সাবইকে চলে যেতে বলেন। তাঁর এ শাহাদাতের দ্বারা ফেৎনার দরজা উন্মুক্ত হয় এবং মুসলমানদের ঐক্যের মাঝে ফাটল ধরে।

এরপর সবার ঐক্যমতে খলিফা নির্বাচিত হলেন আলী ইবনে আবি তালিব [ﷺ]। কুচক্রীদল আলী [ﷺ]-এর সৈন্যদলে কৌশলে প্রবেশ করে এবং তলে তলে তাদের কুমতলব চালাতেই থাকে।

এদিকে মু'আবিয়া [ﷺ] তখন সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর বংশের খলিফা উসমান [ﷺ]-এর

হত্যার সঙ্গে জড়িত খুনিদের বিচার করার জন্য আলী [ﷺ]-এর প্রতি জোরালো চাপ সৃষ্টি করেন। তবে তিনি আলী [ﷺ]-এর খেলাফত বা তাঁকে অস্বীকার এবং খলিফার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিদ্রোহ করেননি।

মু'আবিয়া [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: আপনি কি আলী [ﷺ]-এর খেলাফতের ব্যাপারে বিরোধিতা করছেন? আপনি কি তাঁর অনুরূপ? উত্তরে মু'আবিয়া [ﷺ] বলেন: আমি অবশ্যই জানি আলী [ﷺ] আমার চাইতে উত্তম এবং খেলাফতের বেশি হকদার। কিন্তু তোমরা কি জান না! উসমান [ﷺ]কে মজলুম অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে? আর আমি তাঁর চাচার ছেলে? আমি তো শুধুমাত্র তাঁর খুনের বদলা চাই--।[১]

নি:সন্দেহে একজন আত্মীয় হিসাবে মু'আবিয়া [ﷺ] উসমান [ﷺ]-এর খুনিদের বিচার দাবি করার অধিকার ছিল। কিন্তু আলী [ﷺ] একজন বড় মানের রাজনীতিবিদ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি

[১]. তারীখুল ইসলাম–ইমাম যাহাবী: ১/ ৪৬৫ দ্র:, সিয়ার আ'লামুন নুবালা:৩/১৪০, বেদায়া-নেহায়া–ইবনে কাসীর: ৮/১৩৮ ও তারীখে দিমাশক: ৫৯/১৩২

বললেন: রাষ্ট্রের অবস্থা বর্তমানে নাজুক। এ পরিস্থিতিতে খুনিদের বিচারকার্য বাস্তবায়ন করা কঠিন। প্রথমে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও ফেৎনা আয়ত্বে আনতে হবে তারপর বিচার করা হবে।

অন্য দিকে পরিস্থিতি শান্ত করার উদ্দেশ্যে কিছু সাহাবীগণের পরামর্শে মা আয়েশা (র:) মক্কা হতে বাসরার দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু অবস্থা বড় কঠিন দেখে তিনি অবাক হয়ে পড়েন। পথে আলী [ﷺ]-এর সাথে আলোচনার পর তিনি মদিনায় ফিরে যাওয়ার সংকল্প করেন। কিন্তু ঐ কুচক্রীদলটি রাত্রে অতর্কিতভাবে মা আয়েশা (রা:)-এর সঙ্গীদের উপর হামলা চালায়। যার ফলে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

ঐ দিকে মু'আবিয়া [ﷺ] তাঁর মতের উপরেই অনঢ় থাকেন। অন্যদিকে আলী [ﷺ] মু'আবিয়া [ﷺ]কে বাধ্য করার জন্য মদিনা থেকে বের হন। সিরিয়ার সিফফীন নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে দু'দলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পরিশেষে দু'দলের মাঝে সন্ধি দ্বারা সমস্যার সমাধান হয়। এ সন্ধিকে কেন্দ্র করে আলী [ﷺ]-এর দলের লোকেরা দু'ভাগে

বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি শিয়া তথা নিজের দল। আর অপরটি খারেজী তথা বিদ্রোহী দল। আর এটাই ছিল ইসলামে সর্বপ্রথম দলাদলির সূচনা।

ঐ ইহুদি মুনাফেক দলটি গোপনে গোপনে ইসলামের বিদ্বেষ আরো শক্তিশালী করার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র আঁটে। তারা তিনজন মানুষকে নিযুক্ত করে তিনজনকে হত্যা করার জন্য। খারেজী আব্দুর রহমান ইবনে মুলজেমকে আলী [ﷺ]কে হত্যা করার জন্য এবং অপর দু'জনকে মু'আবিয়া ও আমর ইবনে 'আস [ﷺ]কে হত্যা করার জন্য। কিন্তু ইবনে মুলজেম আলী [ﷺ]কে হত্যা করতে সক্ষম হলেও অপর দু'জন ব্যর্থ হয়। ইহা ছিল ৪০ হিজরির ঘটনা।

ঐ দলটি এ হত্যার দায়ভার চাপিয়ে দেয় মু'আবিয়া [ﷺ]-এর উপর। যেহেতু দু'জনের মাঝে রাজনৈতিক সমস্যা ছিল বিদ্যমান। তাই বাহ্যিকভাবে সাধারণ মানুষরা ধোঁকায় পড়ে গেল।

আলী [ﷺ]-এর হত্যার পর খেলাফতের দায়িত্ব নিলেন তাঁর বড় ছেলে হাসান [ﷺ]। তিনি মাত্র ছয় মাস খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি

মুসলমানদের দু'টি দলের মাঝের ফেৎনাকে নিভানোর জন্য নিজে ও ছোট ভাই হুসাইন [ﷺ]কে সঙ্গে করে মু'আবিয়া [ﷺ]-এর নিকট গেয়ে তাঁর হাতে বায়েত গ্রহণ করেন। আর এটা ছিল রসুলুল্লাহ [ﷺ]-এর ভবিষ্যত বাণীর বাস্তবায়ন; কারণ নবী [ﷺ] বলেন:

« إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ».متفق عليه

"নিশ্চয়ই আমার এ সন্তান সাইয়েদ (সর্দার)। আল্লাহ তা'য়ালা তার দ্বারা মুসলমানদের বিরাট দু'টি দলের মাঝে আপোস করে দিবেন।"[১]

এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক ভাবেই চলতে থাকে। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে মু'আবিয়া [ﷺ] দক্ষতার সহিত রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

মু'আবিয়া [ﷺ] হাসান ও হুসাইন [ﷺ]কে সম্মান করতেন। প্রতি বছর তাঁরা মু'আবিয়া [ﷺ]-এর নিকট যেতেন এবং তিনি তাঁদেরকে এক লক্ষ করে দিরহাম

---

১. বুখারী ও মুসলিম

দিতেন। একবার চার লক্ষ দিরহাম পুরস্কার দেন। হাসান [ﷺ]-এর মৃত্যুর পর হুসাইন [ﷺ] মু‘আবিয়া [ﷺ]-এর নিকট যেতেন এবং তিনি তাঁকে আহলে বাইতের যথাযথ সম্মান ও মহব্বত করতেন।

হিজরি ৫০ সালে মাদীনাতু কাইসার[১] শহরে (অর্থাৎ রোম সম্রাটের শহর ইস্তাম্বুলে) বিজয়ের জন্য সৈন্যদল পাঠানোর সময় মু‘আবিয়া [ﷺ] হুসাইন [ﷺ]কে ডেকে পাঠালে তিনি তাতে শরিক হন। আর সে সেনাদলের সেনাপতি ছিলেন মু‘আবিয়া [ﷺ]-এর ছেলে এজিদ (রহ:)। রসুলুল্লাহ [ﷺ] এ যুদ্ধ সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে বলেন:

« أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ ».

رواه البخاري.

“আমার উম্মতের যে প্রথম সৈন্যদলটি কাইসার শহরে (ইস্তাম্বুলে) যুদ্ধ করবে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত।”[২]

---

১. কাইসার সেকালের রোম সম্রাটের উপাধি

২. বুখারী হাঃ নং ২৭০৭

নি:সন্দেহে এ হাদীসটি এজিদ ইবনে মু'আবিয়া [রহ:] সম্পর্কে যারা মিথ্যা অপপ্রচার করে থাকে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত দলিল।

3 সমস্যার সূচনা:

মু'আবিয়া [ﷺ] তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ছেলে এজিদকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচন করেন। তার বায়েত গ্রহণ করার জন্য গভর্নরদেরকে ফরমান জারি করেন। মু'আবিয়া [ﷺ]-এর মৃত্যুর পর হিজরি ৬০সালের রজব মাসের ১৫ তারিখ এজিদ (রহ:) খেলাফতের দায়িত্বভার হাতে নেন। আর যথাযথ ও যোগ্যতার সাথে খেলাফতের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন।

এদিকে মদিনার অধিকাংশ মানুষ এজিদের বায়েত গ্রহণ করলেও হুসাইন [ﷺ] বায়েত করা থেকে বিরত থাকেন। এ সুযোগে ঐ কুচক্রীদলটি কুফা থেকে হুসাইন [ﷺ]কে পত্রের পর পত্র পাঠাতে থাকে। চিঠির বিষয় হলো: আমরা এজিদকে মানি না। আমরা আপনার হাতে বায়েত হব। আপনি কুফায় হাজির হয়ে আমাদের বায়েত গ্রহণ করুন। পত্রের সংখ্যা ৫০০

শতের অধিক ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।

হুসাইন [ﷺ] অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য চাচাত ভাই মুসলিম ইবনে 'আকিল [ﷺ]কে কুফায় প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে হানী ইবনে 'উরওয়ার বাড়িতে অবস্থান করে হুসাইন [ﷺ]-এর নামে বিশ হাজরের অধিক মানুষের বায়েত নেন। আর হুসাইন [ﷺ]-এর নিকট পত্র পাঠান যে, তাঁর নামে বায়েত গ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে, যত তাড়াতাড়ি কুফায় আগমন করুন।

এদিকে হুসাইন [ﷺ] মুসলিমের পত্র পেয়ে যিলহজ্ব মাসের ৮তারিখ মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশে রওয়ানা হন। এ খবর এজিদের নিকট পৌঁছলে বাসরার আমীর উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে নির্দেশ করেন যে, তুমি বাসরার সাথে কুফারও দায়িত্ব গ্রহণ কর। অন্য দিকে কুফার সাবেক আমীর নু'মান ইবনে বাশীরকে বরখাস্ত করেন; কারণ তিনি মুসলিমকে সাহায্য করেন। এজিদ ইবনে জিয়াদকে কুফায় বিদ্রোহীদের ব্যাপারে সতর্ক

থাকার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু হুসাইন [ﷺ]কে হত্যার জন্য কোন প্রকার নির্দেশ দেননি।

এদিকে মুসলিম ইবনে আকিল [ﷺ] চার হাজার মানুষ সঙ্গে করে কুফার গভর্নর হাউসে পৌঁছে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইবনে জিয়াদ টের পেয়ে গেট বন্ধ করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। আর বিভিন্ন গোত্রের প্রধানদেরকে অর্থের বিনিময়ে মানুষকে মুসলিম ইবনে আকিল থেকে দূর করার জন্য নির্দেশ দেয়। ফলে ভাগতে থাকে একে একে অনেকে। শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে মাত্র ৩০জন। মুসলিম তাদেরকে সঙ্গে করে মাগরিবের সালাত আদায় করেন। অন্ধকার ঘনিভূত হলে মুনাফেকরা ভেগে যায় সকলে, বাকি থাকেন একা মুসলিম। শেষ পর্যন্ত মুসলিম অন্ধকারে অচেনা জায়গায় কি করবেন, কথায় যাবেন, পড়লেন মহাবিপাকে ।

ওদিকে ইবনে জিয়াদ বিভিন্ন গোত্রপতিদের সঙ্গে করে নিয়ে মুসলিমের খোঁজে বের হয় এবং যে মুসলিমকে হত্যা করবে তার কোন কেসাস নেই বলে ঘোষণা করে। আর যে জিন্দা হাজির করবে তার জন্য

ঘোষণা করে বিশেষ পুরস্কার। শেষ পর্যন্ত মুসলিমকে ধরে ফেললে তিনি হুসাইন [ﷻ] ও তাঁর পরিবারের জন্য ভীষণ কাঁদেন। পরিশেষে হত্যার পূর্বে হুসাইনের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লেখেন যে, আপনি স্বপরিবারে ফিরে যান। এখানকার মানুষ খেয়ানত করেছে। কিন্তু কুচক্রদলের লোকেরা পত্র বাহককে পথেই হত্যা করে ফেলে; যাতে করে হুসাইন [ﷻ] তাঁর যাত্রা অব্যহত রাখেন। আর মুসলিমকে হত্যা করা হয় আরাফাতের দিনে।

এদিকে হুসাইন [ﷻ]-এর কুফার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার কথা শুনে ইবনে আব্বাস [ﷻ] বলেন: আপনি তাদের নিকটে যাচ্ছেন যারা আপনার বাবা ও বড় ভাই হাসানকে হত্যা করেছে। একই কথা তাঁর বিমাতা ভাই মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াও [ﷻ] বলেন। এ ছাড়া আবু সাঈদ খুদরী, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর অনেকে কুফায় যাওয়ার ব্যাপারে তাঁকে শক্তভাবে বাধা প্রদান করেন।

ইবনে উমার [ﷻ] জানতে পেরে দুই বা তিন দিনের রাস্তা ঘোড়া দৌড়িয়ে পথে দেখা করে বলেন:

আপনি কক্ষনো কুফায় যাবেন না। কিন্তু হুসাইন [ﷺ] অস্বীকার করলে বলেন: রসুলুল্লাহ [ﷺ]কে আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে এখতিয়ার করার সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি আখেরাতকে এখতিয়ার করে ছিলেন। আপনিও আহলে বাইতের মানুষ আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। এরপর তিনি তাঁকে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসেন।

হুসাইন [ﷺ] যখন জানতে পারেন যে, অবস্থা ঘোলাটে তখন ফিরে আসার চিন্তা করলে মুসলিম ইবনে আকিলের সন্তানরা [ﷺ] বলেন: আমাদের বাবার প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত ফিরে যাব না।

এদিকে ইবনে জিয়াদ পরিস্থিতির মুকাবেলা করার জন্য প্রথমে হুর ইবনে এজিদ আত্তাইমীর নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্য প্রেরণ করে। পরে উমার ইবনে সা'দের নেতৃত্বে আরো চার হাজার সৈন্য পাঠায়।

অবস্থা খারাপ দেখে হুসাইন [ﷺ] তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন। (১) আমাকে তোমরা মদিনায় ফিরে যেতে দাও। (২) অথবা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে দাও। (৩) আর না হয় শামে এজিদের নিকটে যেতে

দাও। কিন্তু ইবনে জিয়াদ কোন প্রস্তাব না মেনে হুকুম জারি করে যে, আমার হুকুম মানতে হবে আর না হয় যুদ্ধ করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেয়।

হুসাইন [ﷺ]-এর সঙ্গে ছিল মাত্র ৩০জন অশ্ববাহিনী, ৪০জন পদাতিক বাহিনী। আর আহলে বাইতের ছোট ছোট বাচ্চা ও নারীদের ১৭জন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বাধ্য হন এবং একে একে মোট ৭২জন শহীদ হন। আর নরপশু শিম্মার ইবনে যিল জাওশানের উস্কানিতে পিচাশ খাওলা আল-আসবাহী তাঁর সিনার মধ্যে আঘাত করে এবং মালাউন সিনান ইবনে আনাস আন-নাখাঈ হুসাইন [ﷺ]কে হত্যা করে।

এ ভাবেই ৬১হিজরির ১০ই মোহররম রোজ শুক্রবার কারবালার প্রান্তে ৩৩টি তীর, বর্ষা ও তালোয়ারের আঘতপ্রাপ্ত হয়ে নির্মমভাবে শহীদ হলেন হুসাইন [ﷺ]। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৮বছর। এরপর শয়তানরা লুটপাট করে নেয় আহলে বাইতের সমস্ত মাল-সম্পদ।

আহলে বাইতের যারা শহীদ হলেন

আলী [ﷻ]-এর সন্তান: আবু বকর, উমার ও উসমান [ﷻ]।

হাসান [ﷻ]-এর সন্তান: আবু বকর, উমার ও তালহা [ﷻ]।

হুসাইন [ﷻ]-এর সন্তান: আলী আল-আকবার ও আব্দুল্লাহ [ﷻ]।

আকিল [ﷻ]-এর সন্তান: জাফর, আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে আকিল ও মুসলিম [ﷻ]।

আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর [ﷻ]-এর সন্তান: আওন ও মুহাম্মদ [ﷻ]।

আহলে বাইতের বংশে বাতি জ্বালানোর জন্য শুধুমাত্র বাকি থাকেন জাইনুল আবেদীন আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী [ﷻ]।

এদিকে হুসাইন [ﷻ]-এর মাথা কেটে ইবনে জিয়াদের নিকট হাজির করা হলে অপমান করে। এরপরে আহলে বাইতের মহিলা ও শিশুদের ও হুসাইন [ﷻ]-এর মাথা এজিদের নিকট পৌঁছানো হয়।

এজিদ এ ধরণের বরবরতা দেখে অবাক হন ও ইন্নাা লিল্লাাহ পড়ে হত্যাকরীকে ধিক্কার দেন। আর শামের রাজপ্রাসাদে কান্নার রোল পড়ে যায়। পরে এজিদ আহলে বাইতের বাকি সকলকে ও হুসাইন [ﷺ]-এর মাথা সম্মানের সহিত মদিনা পর্যন্ত পৌঁছানোর সুব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মদিনায় 'বাকিউল গারকাদ' কবরস্থানে তাঁর মা ফতেমা (রযিয়াল্লাাহু আনহা)-এর পার্শ্বে হুসাইন [ﷺ]-এর মস্তক সমাহিত করা হয়।[১]

নোট:

আল্লামা মাহমূদ শাকের তাঁর 'তারিখুল ইসলাম' কিতাবে লিখেছেন: এজিদ সম্পর্কে যা কিছু লিখা হয়েছে তার মধ্যে তিনি শিকার করা পছন্দ করতেন ছাড়া সবই মিথ্যা।[২] আর শিকার করা সেকালের বাহুদুরীর আলামত ধরা হত।

---

[১]. হাফেজ যাহাবীর সিয়ায় আ'লামুন নুবালাঃ ৩/২৯২-- ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াঃ ৪/৫০৫-- ইবনে কাসির-বেদায়া-নেহায়াঃ ৮/৯৫-১৬৫ মান কাতালা হুসাইন পৃঃ আলআওয়াসেম ওয়াল কাওয়াসেমঃ ইবনুল আরাবী দ্রঃ

[২]. তারিখুল ইসলাম দ্রঃ

কারবালা ও মানুষের প্রকার

প্রথম প্রকার:

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত:

এঁদের আকিদা হলো আল্লাহ তা'আলা হুসাইন [ﷺ]কে শাহাদাতের দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং যারা তাঁকে হত্যা করেছে বা তাতে সাহায্য করেছে কিংবা এ হত্যাকে স্বীকার করেছে আল্লাহ তাদেরকে অপমান করেছেন। আর এর দ্বারা রসুলুল্লাহ [ﷺ]-এর ভবিষ্যতবাণী বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি [ﷺ]বলেছেন:

« أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَقْتُلُ ابْنِي هَذَا - يَعْنِي الْحُسَيْنَ - وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِنْ تُرْبَةٍ حَمْرَاءَ ».

"আমার নিকট জিবরীল [عليه السلام] এসে খবর দিলেন যে, আমার উম্মত আমার এ সন্তানকে হত্যা করবে। আর জিবরীল, (রক্তে রঞ্জিত) লাল মাটিও নিয়ে অসেন।"[১]

---

১. হাদিসটি সহীহ, আসসহীহ ওয়ালযঈফুল জামি'–আলবানী হাঃ ৬১

তিনি ও তাঁর ভাই হাসান [ﷺ] জান্নাতের যুবকদের সর্দার হবেন। তাঁরা দু'জনেই ইসলামের ছায়াতলে লালিত-পালিত হয়েছেন। কিন্তু হিজরত ও জিহাদ ও বিপদে ধৈর্যধারণের সুযোগ তাঁদের ভাগ্যে জুটেনি, যা আহলে বাইতের অন্যান্য সদস্যদের নসীব হয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'য়ালা শাহাদাতের মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা, সম্মান ও ইজ্জতকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আহলে সুন্নত ওয়ালজামাত আহলে বাইতকে চরমভাবে ভালবাসেন এবং মনে করেন যে, তাঁদের প্রতি দরুদ না পড়া পর্যন্ত তাদের সালাত সহীহ-বিশুদ্ধ হয় না। আহলে বাইত সম্পর্কে কুরআন ও সহীহ হাদিসে বর্ণিত তাঁদের মহত্ব ও কৃতিত্তসমূহ স্বীকার ও বর্ণনা করেন। আর হুসাইন [ﷺ] ও তাঁর পরিবারের হত্যাকে এক বিরাট মসিবত মনে করেন। মসিবতের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা "ইন্নাা লিল্লাাহি ওয়া ইন্নাা ইলাইহি র-জি'উন" পড়ার বিধান করেছেন ও ধৈর্যশীলদের জন্য রেখেছেন অসংখ্য প্রতিদান।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

- , + * (' & % $ # " ! [

6 5 4 3 2 1 0 / .

@ ? > = < ; 9 8 7

L K J I H G F E D C B A

البقرة Z S R Q P N M

“আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বল না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। আর অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের- যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় অমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত।” [বাকারা:১৫৪-১৫৭]

দ্বিতীয় প্রকার:

শিয়া-রাফেজী:

যারা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিথ্যার পাহাড় গড়েছে এবং বহু জাল হাদীস বানিয়েছে। জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন ধরণের বিদাত, কুসংস্কার, মিথ্যা গল্প ও বাতিল আকিদা। তারা সাহাবাগণ ও আহলে সুন্নাত ওয়ালজামাতকে গালি-গালাজ, অভিশাপ ও অপবাদ এবং কাফের ফতোয়া দিয়েছে। আর আহলে বাইতের মহব্বতের নামে ইসলাম ও মুসলমানকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

এ সবের মূলে ইহুদি মুনাফেক আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার কুচক্রিদলের শয়তানরা। যারা ইসলাম ও মুসলমানের জাতীয় ও ঘরের চরম শত্রু এবং হিংসা-বিদ্বেষকারী।

তৃতীয় প্রকার:

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সাধারণ মানুষ:

যারা অজ্ঞতাবশত: দ্বিতীয় দলের সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের আকিদা ও বিদ‘আতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা উঠিয়ে অনুষ্ঠান ও শিন্নি পাকিয়ে বিতরণ করে।

চতুর্থ প্রকার:

নাসেবীয়া:

যারা দ্বিতীয় দলের বিপরীতে এ দিনটিকে আনন্দ-উল্লাসের জন্য নির্ধারিত করে এবং সাজ-সজ্জা ও পানাহারে মত্ত থাকে। আর এ জন্য বানিয়েছে তারা বহু জাল হাদীস। যেমন: এ দিনে সুরমা ব্যবহার এবং পরিবারের খরচে স্বচ্ছলতার হাদীস।

কারবালা কেন্দ্রিক বিদাত, কুসংস্কার ও মিথ্যা কেচ্ছা-কাহিনীঃ

- উড়িয়া যায়রে জোড় কবুতর মা ফাতেমা কেঁন্দে কয়, আজ বুঝি কারবালার আগুন লেগেছে মোর কলিজায়। মা ফতেমার কাঁন্দন শুনে আরশ থেকে আল্লাহ কয়, জাওগো জিব্রিল বাতাস কর মা ফতেমার কলিজায়। পুত্র শোকে কলিজা জ্বলে বাতাসে কি ঠাণ্ডা হয়।[১]
- ইহা একটি মিথ্যা কথা; কারণ ফাতেমা (রা:) মৃত্যুবরণ করেন ১১হিজরিতে আর হুসাইন [ﷺ] শহীদ হন ৬১ হিজরিতে। দুইজনের মাঝে প্রায় ৫০বছরের ব্যবধান।
- ওঠে আসমান জমিনে মাতম কাঁদে মানবতা: হায় হোসেন! (ফারুক আহমাদ) ইহা শিয়াদের আকিদা।
- ঐ যে মোহররমের নিশান তাজিয়া প্রভৃতি দেখা যায়। (বেগম রোকেয়া) ইহা শিয়াদের কাজ।

---

[১]. আমাদের দেশে জারি গানে এমন গান গেয়ে থাকে।

১. মাতম ও তাজিয়া (শোকানুষ্ঠান) করা, হায় হুসেন! হায় হুসেন! হায় আলী! হায় ফাতেমা! বলা, যা বড় শিরক। ইহা সর্বপ্রথম আব্বাসীয় বাদশাহ মতীউল্লাহ এর যুগে মিশরের আমীর মুইজ্জুদ্দৌলা ৩৫২ হিজরিতে মিশরে চালু করেছিল। আর সরকারীভাবে ছুটি ঘোষণা করে সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ রেখে দু:খ ও শোক প্রকাশের জন্য ফরমান জারি করেছিল।
২. হুসাইন ও আহলে বাইতের বিভিন্ন জনের কৃত্রিম কবর বানিয়ে ঝাণ্ডা উড়িয়ে শহরে-বন্দরে ও গ্রাম-গঞ্জে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টাকা-পয়সা উঠানো। এসব শরিয়ত পরিপন্থী কাজ।
৩. বিলাপ করা, বুক চাপড়ান, শরীরে চাবুক ও চাকু মারা ও মুখ খামচান যা ইসলামে কবিরা গুনাহ ও জাহেলিয়াতের কাজ।

৪. জাল হাদীস বানানো যেমন: আশুরার রোজা রহিত হওয়ার জাল হাদীস। ইচ্ছা করে নবী [ﷺ]-এর নামে জাল হাদীস গড়া মানে নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানানো।

৫. মিথ্যা কেচ্ছাকাহিনীর বর্ণনা ও তার প্রচার। যেমন: মির মুশাররফ তার বিষাদ সিন্ধুর মধ্যে ঘটিয়েছে বহু মিথ্যা ঘটনার সমাহার। মির মুশাররফ ছিল একজন শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। এ মিথ্যার সিন্ধু বইটি বাংলাভাষী সুন্নী মুসলমানদের মাঝে শিয়াদের বাতিল আকীদা ও জঘন্য বিশ্বাসের বীজ বপন করেছে।

৬. সাহাবীগণকে গালি-গালাজ করা। বিশেষ করে মু'আবিয়া, আমর ইবনে 'আস [ﷺ] ও এজিদ এবং অন্যান্যদেরকে কাফের বলা বা মনে করা। ইহা কুফরি বা কবিরা গুনাহ।

৭. গুরুত্ব সহকারে বিভিন্ন ধরণের আলোচনা সভার আয়োজন করা এবং হুসাইন [ﷺ]-এর কারবালার ঘটনা বর্ণনা করা। আর এ দিন একত্রিত হয়ে জিকির ও দোয়া করা এবং মসজিদে মসজিদে

হুসাইন [ﷺ]-এর শাহাদাতের সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে আলোচনা করা।

৮. বিভিন্ন প্রকার বাতিল আকিদার প্রচার, কুসংস্কার ও বিদাতের প্রসার করা। যেমন: এ মাসে বিবাহ করলে সংসার সুখী হবে না কিংবা বাচ্চা হলে নাফরমান হবে ইত্যাদি।

৯. "ইসলাম জিন্দা হোতা হায় হার কারবালাকে বাদ" এ ধরণের মিথ্যা উক্তি পেশ করা; কারণ কারবালার দ্বারা ইসলাম ধ্বংস হয়েছে।

১০. হুসাইনের নামে বিভিন্ন ধরণের খানাপিনা পাক করা এবং শরবত ও দুধ বিতরণ করা।

১১. মোহররম মাসকে শোক ও দু:খের মাস মনে করে বিবাহ ও গোশত না খাওয়া এবং কোন প্রকার খোশবু না লাগানো ও আগুন না জ্বালানো ইত্যাদি।

১২. শোক পালনের জন্য কালো বা সবুজ রঙের কাপড় পরিধান করা এবং এ মাসে স্ত্রী সহবাস ও খাটের উপর শয়ন না করা।

১৩. হুসাইন [ﷺ]-এর ঘোড়া বানিয়ে তার চতুষ্পার্শ্বে ছোট ছোট বাচ্চাদের তার ফকির বানানো এবং এ ধারণা করা যে, এ সময় হুসাইন [ﷺ]-এর রুহ-আত্মা হাজির হয়।
১৪. 'বিষাদ সিন্ধু' যা আসলে 'মিথ্যার সিন্ধু' বই পড়া বা খতম দেয়াকে পুণ্যের কাজ মনে করা।
১৫. আকাশের লালিমাকে হুসাইন [ﷺ]-এর শাহাদাতের রক্ত ধারণা করা।
১৬. আশুরার দিনকে কেন্দ্র করে নারী-পুরুষ আবাধে মেলামেশা করে মিটিং-মিছিল ও রেলী বের করা। আর এর জন্য বিরাট অংকের টাকা-পয়সা খরচ করা।
১৭. আশুরার দিনে রুটি না পাকানো, ঝাড়ু না দেয়া।
১৮. হুসাইন [ﷺ]-এর কৃত্রিম লাশ বানিয়ে তাতে নজর-নিয়াজ পেশ করা, সম্মান প্রদর্শন ও সেজদা করা; যা শিরক এবং দাফন না করা পর্যন্ত কোন কিছু পানাহার না করা।
১৯. আশুরার রোজা পালন না করে খানাপিনায় ব্যস্ত থাকা।

২০. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই হুসাইন (রা:) শহীদ হয়েছেন বলে ধারণা করা।

২১. আশুরার রাত্রি বিশেষ ইবাদত, জিকির ও আশুরার বিশেষ দোয়া পাঠ করা। আশুরার দোয়া হলো:"হাসবিয়াল্লাহু ওয়ানি'মাল ওয়াকীলু ওয়ান্নাসীর"। এ দোয়া যে পাঠ করবে সে ঐ বছরে মরবে না এবং সে দিনের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে হেফাজত করবেন। এসব বাতিল আকিদা।[১]

২২. হুসাইন [ﷺ]-এর কাঠের বানানো কবরকে রঙ্গিন কাগজ দ্বারা সাজানো ও রাস্তায় রাস্তায় নিয়ে ঘুরা এবং হায় হুসেন! হায় হুসেন! বলে মাতম করা।

২৩. আশুরার সালাত কায়েম করা। অশুরার দিন জোহর ও আসরের মাঝে চার রাকাত নামাজ। পড়ার নিয়ম প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, আয়াতুল কুরসি একবার, সূরা এখলাস দশবার, সূরা ফালাক ও নাস পাঁচবার করে। যখন সালাম

[১]. বাকর বিন আব্দুল্লাহ আবু জায়েদ এর তাসহিহুদ দোয়া পৃঃ১০৯-১১০

ফিরাবে তখন আস্তাগফিরুল্লাহ ৭০বার। এ ধরণের নামাজের হাদীস জাল।[১]

২৪. আশুরার দিন ফজর সালাতে যে সূরায় মূসা [عليه السلام]-এর নাম উল্লেখ আছে এমন সূরা তেলাওয়াত করা।[২]

২৫. আশুরার দিনের বখূর (চন্দন কাঠের ধোঁয়া) হিংসা-বিদ্বেষ, জাদু ও দুর্দশার জন্য ঝাড়ফুঁক ও ঔষধ মনে করা।[৩]

২৬. আশুরার দিনে যে গোলাপ জলে সূরা ফাতিহা ৭বার পড়ে নিজের ও পরিবারের স্ত্রী ও সন্তানদের মাথা ও চেহারায় মাখবে সে আগামি বছরের আশুরা পর্যন্ত সর্বপ্রকার রোগ ও বালা-মসিবত থেকে মুক্ত থাকবে। এ আকিদাও বাতিল।[৪]

---

[১]. সয়ূতীর আল্লাআলীল মাসনূ'আ ২/৯২ ইবনু আররাকের তানজিহুশ শারিয়াহ ২/৮৯

[২]. বিদাউ কুররা' পৃঃ ৯ মু'জামুল বিদা' পৃঃ ৩৯২

[৩]. বাকর বিন আব্দুল্লাহ আবু জায়েদ এর তাসহিহুদ দোয়া পৃঃ১০৯-১১০

[৪]. বিদা' ওয়া আখতা তাতা'আল্লাকু বিলআইয়ামি ওয়াশশুহূর আহমাদ বিন আল্লাহ আসসুলামী পৃঃ২২৯

২৭. আশুরার দিন কবরের পার্শ্বে জমায়েত হওয়া বা কবর জিয়ারতের জন্য সফর করা।[১]

২৮. প্রতি বছর আশুরার দিনে শোক পালান করা। অথচ শরিয়তে স্ত্রী ছাড়া অন্যান্যদের জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হারাম। আর স্ত্রীর জন্য স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশ দিন ইদ্দত। এ ছাড়া সর্বপ্রকার শোক পালন করা জঘন্য বিদাত ও ইহুদি-খ্রীষ্টারদের অনুসরণ-অনুকরণ।

[১].আলবানীঃ আহকামুল জানায়েজ পৃঃ২৫৮ ইবনে তাইমিয়াঃ ইকতিযা ২/৭৩৫

মিথ্যা ও কুসংস্কার মূলক একটি কেস্‌সা

বর্ণিত রয়েছে যে, একজন ফকির আশুরার দিন সে ও তার পরিবার রোজা রাখে। সেদিন এফতারি করার মত তার ঘরে কিছুই ছিল না, তাই এফতারির তালাশে বের হয়ে কোথাও কিছু না পেয়ে বাজারে প্রবেশ করে। মুদ্রা ব্যবসায়ীদের বাজারে প্রবেশ করে একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর নিকটে গিয়ে সালাম দিয়ে বলল: জনাব, আমাকে একটি দিরহাম ঋণ দেন যা দ্বারা আমি পরিবারের এফতারি ক্রয় করব এবং আপনাকে এ দিনে দা'ওয়াত করছি। ব্যবসায়ী তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং তাকে কিছুই দিল না।

ফকির ব্যক্তি মনে বড় ব্যথা নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ফিরার পথে তার ইহুদি প্রতিবেশী দেখতে পেয়ে তার পেছনে দাঁড়িয়ে বলল: আমার বন্ধুর সাথে তোমাকে কথা বলতে দেখলাম। সে ঘটনা বর্ণনা করে বলল: তুমি আমাকে এফতারি করার জন্য কিছু দাও তোমার জন্য এ দিনে দোয়া করব। ইহুদি বলল: ইহা

কোন দিন? ফকির বলল: এদিন হচ্ছে আশুরার দিন এবং সে এ দিনের কিছু ফজিলত বর্ণনা করল।

ইহুদি তাকে দশ দিরহাম দিয়ে বলল: যাও এ দিনের সম্মানে তোমাকে দান করলাম, তোমার পরিবারের জন্য ইহা খরচ কর। ফকির খুশি মনে এফতারি নিয়ে বাড়ি ফিরল এবং পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের খানাপিনার ব্যবস্থা করল।

অন্যদিকে রাত্রিবেলা মুসলিম মুদ্রা ব্যবসায়ী স্বপ্নে দেখল যে, কিয়ামত যেন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং সে চরম পিপাসা ও বিপদগ্রস্ত। এ সময় সে দেখল সাদা মণি-মুক্তার একটি প্রাসাদ, তার দরজাগুলো লাল ইয়াকূত পাথরের। সে মাথা উঠিয়ে বলল: ওহে, এ প্রাসাদের মালিক আমাকে এক ঢোক পানি পান করাও। সে প্রসাদটি বলল: কালকে এ প্রসাদটি তোমার ছিল। কিন্তু যখন তুমি ঐ ফকির ব্যক্তির মনে ব্যথা দিয়ে ফেরত দিয়েছিলে তখন তোমার নাম মিটিয়ে দিয়ে তোমার ইহুদি প্রতিবেশীর নাম লেখা হয়েছে; কারণ সে ফকির ব্যক্তির দু:খ দূর করে তাকে দশ দিরহাম দান করেছে।

মুসলিম মুদ্রা ব্যবসায়ী সকালে আতঙ্কিত অবস্থায় নিজের প্রতি ধ্বংস ও মৃত্যুর বদ্দোয়া করতে করতে তার ইহুদি প্রতিবেশীর নিকটে গিয়ে বলল: তুমি আমার প্রতিবেশী, আমার তোমার প্রতি অধিকার রয়েছে ও তোমার নিকট আমার কিছু প্রয়োজন রয়েছে। ইহুদি বলল: কি সে প্রয়োজন বলুন! মুসলিম ব্যক্তি বলল: তোমার গত কালের যে দশ দিরহাম ফকির ব্যক্তিকে দান করেছ তার সওয়াব একশত দিরহামের বদলাই আমার নিকট বিক্রি করে দাও।

ইহুদি বলল: না, আল্লাহর কসম! এক লক্ষ দিনারের বদলাই দিব না। আর গত রাতে যে প্রাসাদ দেখেছ তার দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইলেও তোমাকে সুযোগ দেব না।

মুসলিম ব্যক্তি বলল: কে তোমাকে এ সংরক্ষিত গোপন রহস্য অবগত করিয়েছে? ইহুদি বলল: সেই মহান সত্বা যিনি কোন জিনিসের জন্য হও বললে, হয়ে যায়। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ [ﷺ]

আল্লাহর বান্দা ও রসূল। এ বলে ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করে।[১]

[১]. ই'য়ানাতুত ত্বলিবীন–দিময়াত্বী আবু বকরঃ ২/২৬৭ দ্রঃ

কারবালা ও কিছু জাল-য‘য়ীফ হাদীস

(ক) জাল হাদীসঃ

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেনঃ [দীর্ঘ জাল হাদীস] নিশ্চয় আল্লাহ তা‘য়ালা বনি ইসরাঈলদের প্রতি বছরে একটি রোজা ফরজ করেছিলেন সেটি হলো আশুরার দিন। ইহা মুহররমের দশ তারিখ। এ দিনে তোমরা রোজা রাখ এবং পরিবারের জন্য খানাপিনায় পর্যপ্ততা ঘটাও; কারণ যে এ দিনে নিজের পরিবর-পরিজনের প্রতি খাদ্যে প্রশস্তা করবে আল্লাহ তা‘য়ালা তার সারা বছরে প্রাচুর্যতা দান করবেন।

এটি এমন দিন যে দিনে আল্লাহ তা‘য়ালা আদম [عليه السلام]-এর তওবা কবুল করে তাকে শফিউল্লাাহ বানিয়েছেন, এ দিনে ইদ্রিস [عليه السلام]কে উঁচু স্থানে উঠিয়েছেন, নূহ [عليه السلام]কে কিশতী হতে বের করেন, ইবরাহীম [ﷺ]কে নমরুদের আগুন থেকে নিস্কৃতি দেন, মূসা [عليه السلام]-এর প্রতি এ দিনে তওরাত নাজিল করেন, ইউসুফ [عليه السلام]কে জেলখানা হতে বের করেন,

এ দিনে ইয়াকুব [عليه السلام]-এর চোখের জ্যোতি ফেরত দেন, এ দিনে আইয়ূব [عليه السلام]-এর বিপদ দূর করেন, ইউনুস [عليه السلام]কে মাছের পেট থেকে বের করেন, এ দিনে বনি ইসরাঈলদের জন্য সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেন, এ দিনে দাঊদ [عليه السلام]কে মাফ করেন এবং সুলাইমান [عليه السلام]কে বাদশাহী দান করেন, এ দিনেই মুহাম্মদ [ﷺ]-এর আগের-পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন।

ইহাই প্রথম দিন যে দিনে আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, এ আশুরার দিনে আসমান থেকে সর্বপ্রথম বৃষ্টি নাজিল হয়, আশুরার দিনে সর্বপ্রথম রহমত নাজিল হয়। এতএব, যে আশুরার দিন রোজা রাখবে সে যেন সারা বছর রোজা রাখল। আর ইহা হলো সমস্ত নবীদের রোজা।

যে আশুরার রাত্রি এবাদতের মাধ্যমে জাগবে সে যেন সাত আসমানবাসীর ন্যায় এবাদত করল। আর যে এ রাতে চার রাকাত সালাত আদায় করবে, যার প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা একবার ও সূরা এখলাস

একান্নবার তার পঞ্চাশ বছরের পাপারাজি মাফ করে দেয়া হবে।

যে আশুরার দিনে কাউকে পানি পান করাবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে রোজ কিয়ামতের দিনে এমন পানি পান করাবেন যার পরে তার কখনো পিপাসা লাগবে না এবং সে যেন এক চোখের পলকও আল্লাহর নাফরমানি করে নাই বলে বিবেচিত হবে।

যে এ দিনে দান-খয়রাত করবে সে যেন কক্ষনো কোন ভিক্ষুককে ফেরত দেয়নি।

আর যে এ দিনে গোসল করে পবিত্রা অর্জন করবে সে মৃত্যু ছাড়া এ বছরে আর কোন রোগে আক্রান্ত হবে না।

যে এ দিনে এতিমের মাথায় হাত বুলাবে সে যেন বনি আদমের সমস্ত এতিমের মাথায় হাত বুলালো। আর যে আশুরার দিনে কোন রোগী পরিদর্শন করল সে যেন সকল বনি আদমের রোগীদের পরিদর্শন করল।

এ দিনেই আল্লাহ তা'য়ালা আরশ, লাওহে মাহফুজ ও কলম সৃষ্টি করেছেন। এ দিনেই আল্লাহ

তা'য়ালা জিবরীল [عليه السلام]কে সৃষ্টি করেছেন, ঈসা [عليه السلام]কে আসমানে উঠিয়েছেন এবং এ দিনেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।[১]

২. নূহ [عليه السلام]-এর কিশতী ছয় মাস চলার পর আশুরার দিন জূদী পাহাড়ে পৌঁছে। সেদিন নূহ [عليه السلام] ও তাঁর সাথে যারা ছিল এবং জীবজন্তু আল্লাহর শুকরিয়ার জন্য রোজা রাখে।[২]

৩. যে ব্যক্তি আশুরার দিনে চোখে সুরমা লাগাবে, সে বছর তার চোখ উঠবে না (চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত হবে না) আর যে আশুরার দিনে গোসল করবে সে বছর তার কোন অসুখ হবে না।।"[৩]

৪. যে আরাফাতের দিন রোজা রাখবে তার জন্য দুই বছরের গুনাহ মাফের কাফফারা হবে। আর যে

---

১. ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া:২৫/২২০-৩০০ দ্রঃ

২. সিলসিলা য'য়ীফা-আলবানী: ১১ খণ্ড দ্রঃ

৩. আলবানী (রহঃ)-এর সহীহ ও যঈফুল জামি' হাঃ নং ৫৪৬৭ ও সিলসিলা যঈফা: ২/৮৯ দ্রঃ

মোহররম মাসের একদিন রোজা রাখবে তার জন্য প্রতি দিনের ত্রিশ দিনের সওয়াব মিলবে।[১]

৬. কল্যাণকর কাজ হলো: ঈদুলঅজাহা, ঈদুলফিতর, শবে বরাত ও আশুরার রাত্রি জাগা।[২]

৭. আশুরার দিনে দশটি বা বারটি কাজের মধ্যে রোজা ছাড়া বাকি সকল কাজের হাদীস জাল। তারা বলে থাকে এ দিনের কাজগুলো হলো: বিশেষ নামাজ, রোজা, আত্মীয়তা সম্পর্ক মজবুত করা, দান-খয়রাত করা, গোসল করা, সুরমা লাগানো, আলেম ব্যক্তির জিয়ারত, রোগীর পরিদর্শন, এতিমের মাথায় হাত বুলানো, পরিবারের খানাপিনায় পর্যাপ্ততা ঘটানো, নখ কাটা, সূরা এখলাস একহাজার বার পড়া।

---

[১]. আল-মুওয়ুআত: ২/১০৯, তানজিহুশ শারীয়াহ:২/১৫০ ও সিয়ামু ইয়াওমে আশুরা পৃ: ১৬৮-১৭১

[২]. মীজানুল এ'তিদাল–ইবনে হাজার: ২/৩৯৪, ৪৬৪

(খ) য‘য়ীফ-দুর্বল হাদীসঃ

১. আশুরার দিন রোজা রাখ এবং এক দিন আগে ও এক দিন পরে রোজা রেখে ইহুদিদের বিপরীত কর।[১]

২. আশুরার দিন রোজা রাখ; কারণ এ দিনে সমস্ত নবী রোজা রেখেছেন।[২]

৩. আশুরা তোমাদের পূর্বের সকল নবীর ঈদের দিন। অতএব, তোমরা সেদিনে রোজা রাখ।[৩]

৪. আশুরা হলো নবম দিন।[৪]

৫. যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে আশুরার একদিন আগে এবং একদিন পরে রোজা রাখার জন্য নির্দেশ করব।[৫]

৬. আশুরার দিনে যে পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খানাপিনার ব্যবস্থা করবে তার জন্য আল্লাহ তা‘য়ালা সারা বছরে স্বচ্ছলতা দান করবেন।[১]

---

[১]. সহীহ ও য‘য়ীফুল জামে’-আলবনী হাঃ নং ৩৫০৬

[২]. সহীহ ও য‘য়ীফুল জামে’-আলবনী হাঃ নং ৩৫০৭

[৩]. সহীহ ও য‘য়ীফুল জামে’-আলবনী হাঃ নং ৩৬৭০

[৪]. সহীহ ও য‘য়ীফুল জামে’-আলবনী হাঃ নং ৩৫৭১

[৫]. সহীহ ও য‘য়ীফুল জামে’-আলবনী হাঃ নং ৪৬৪৯

৭. তোমাদের এ দিনে রোজা রেখেছ? তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন: না, তিনি বললেন: তোমাদের দিনের বাকি সময় রোজা পূর্ণ কর এবং কাযা করবে। অর্থাৎ আশুরার দিন।[২]

৮. নবী [ﷺ] এ দিনের গুরুত্ব দিতেন এবং তাঁর ও ফাতেমার দুগ্ধপোষ্যদের ডেকে তাদের মুখে তাঁর থুথু মোবারক দিয়ে দিতেন। আর তাদের মাতাদেরকে রাত্রি পর্যন্ত তাদের দুধ না পান করানোর জন্য নির্দেশ করতেন।[৩]

৯. যদি তুমি রমজানের পর কোন পুরা মাস রোজা রাখতে চাও, তাহলে মোহররম মাসের রাখ; কারণ ইহা আল্লাহর মাস, যাতে আল্লাহ তা'য়ালা এক জাতির তওবা কবুল করেছেন এবং অন্যান্য জাতির তওবা কবুল করবেন।[৪]

[১]. সহীহ ও য'য়ীফুল জামে'-আলবনী হা: নং ৫৮৭৩

[২]. এভাবে বর্ণনা মুনকার, সিলসিলা য'য়ীফা–আলবনী হা: নং ৫২০১

[৩]. হাদীসটি য'য়ীফ, ইবনে খুজাইমা– হা: নং ২০৮৯

[৪]. য'য়ীফ সুনানে তিরমিযী–আলবানী: হাদীস নং ১২০

উপসংহার

পরিশেষে আমাদের করণীয় হচ্ছে: পবিত্র আশুরার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে শত্রুদের কুমতলব হাসিলের খপ্পড়ে পড়া থেকে বিরত থাকা। সেদিনের রোজা রেখে এবং রাখিয়ে সওয়াব অর্জন করাই প্রতিটি মুসলিমের পবিত্র দায়িত্ব।

এ ছাড়া পবিত্র আশুরাকে কেন্দ্র করে যতকিছু মিথ্যার পাহাড় গড়া হয়েছে, সেসব থেকে নিজে ও অন্যান্যদেরকে সাবধান করাও আমাদের একান্তভাবে জরুরি।

কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে জীবন গড়াই হবে আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রত্যাশা।

হে আল্লাহ! মুসলিম সমাজকে সর্বপ্রকার কল্যাণের তওফিত দান করুন এবং সমস্ত শিরক, বিদাত, কুসংস্কার ও মিথ্যা হতে দূরে রাখুন। আমীন!

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.